# ভারত-জাপান সম্পর্কের সত্তরতম বার্ষিকীতে প্রতিরক্ষার বন্ধন জোরদার করা

**বিন্দু মাই চোটানি**

৯ মে, ২০২২

এই বছর ভারত ও জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্কের সত্তরতম বার্ষিকী। এই সত্তর বছরে এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অবিচলিতভাবে এগিয়ে গেছে এবং ২০১৫ সালে নতুন দিল্লি ও টোকিয়ো "স্পেশাল স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড গ্লোবাল" অংশীদার হয়েছে। তবে, ইউ.এস ও চীনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান শত্রুতার ফলশ্রুতি যে ক্ষমতার দোলাচল তা এই অঞ্চলকে গ্রাস করে নিতে পারে। যদি ভারত আর জাপানকে একটি স্থিতিশীল ইন্দো-প্যাসিফিক অন্বেষণের মুখ্য চালক হতে হয়, তাহলে নিজেদের নিরাপত্তা বন্ধনকে উন্নত করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমত, চীন এবং তার উত্থানের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী এবং সে বিষয়ে পদক্ষেপের মধ্যে দুই দেশের ক্ষেত্রেই যে উল্লেখযোগ্য বৈসাদৃশ্য দেখা যায় তার সমাধানের জন্য সম্মিলিত ও সুসঙ্গত পন্থা খুঁজে বের করা দরকার। দ্বিতীয়ত, প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনাবেচার প্রথম যে চুক্তিটি ভারত ও জাপানের মধ্যে হতে চলেছে তা পূরণ করার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। যদি এই "স্বাভাবিক অংশীদার" বা তা সত্ত্বেও এই সামান্য অতিরঞ্জিত "আধা-জোট" তা সম্পন্ন করতে পারে তাহলে, ইন্দো-প্যাসিফিকের বিষয়ে চীনের দৃঢ় পদক্ষেপের পাশে এই লেনদেন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংকেত হিসেবে কাজ করবে।

## উদীয়মান চীনঃ উপলব্ধি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য

চীনের সাম্প্রতিক উত্থানের বিষয়ে এই দুটি দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে, চীনের বিষয়ে নতুন দিল্লি আর টোকিয়োর প্রতিক্রিয়ার নিজস্ব ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যেমন, ১৯৬২ সালের যুদ্ধে ভারতের হার থেকে যে স্পষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষমতার অসাম্য তৈরি হয়েছে তা ভারত-চীনের সম্পর্ককে আকার দিয়েছে। অন্যদিকে, চীনের সঙ্গে জাপানের সংসর্গ গড়ে উঠেছে তার শতাব্দী প্রাচীন সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বন্ধনের মধ্যে দিয়ে (১৯৩০-এর দশকে জাপানের হাতে চীন দখলের ঘটনা সহ)। এছাড়াও, ১৯৭০-এর দশক থেকেই, অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিস্তারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চীনের সমর্থক একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী জাপানের ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এলপিডি)-র মধ্যেই অবস্থান করছে। তাই, যার সঙ্গে মুখ্য বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সেই চীনেরই অবিচলিত উত্থানের কারণে তৈরি হওয়া বিপদের মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও টোকিয়ো আর নতুন দিল্লির প্রতিক্রিয়ার ধরণে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা গেছে।

একদিকে, যেহেতু জাপান এখনও *সেইকি বুন্ডির* চর্চা করে অর্থাৎ রাজনীতি থেকে অর্থনীতিকে আলাদা রাখা নীতিতে বিশ্বাস করে তাই, চীনের মোকাবিলা করতে টোকিয়ো তুলনামূলকভাবে অনিচ্ছুকই ছিল। এর বিপরীতে, ভারতীয় প্রতিষ্ঠানটি যদিও এক সময় জোর দিত যাতে প্রতিরক্ষার বিষয়ে জাপানের সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়টি ঘটে "তৃতীয় কোনও দেশকে বর্জন করে নয় এবং বিশেষ করে চীনকে তো নয়ই", কিন্তু চলতে থাকা লাদাখ সমস্যার ফলাফল হিসেবে ভারতকে চীনের প্রতি ক্রমশ আরও অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। বর্তমান আখ্যানটিবরং আরও বেশি করে মনোযোগ দিচ্ছে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং চীনের উত্থানের বিপরীতে একটি ভারসাম্য আনার প্রচেষ্টার উপর।

এই প্রেক্ষাপটে, উপলব্ধি ও প্রতিক্রিয়া – এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তা সমাধানের প্রথম কার্যকরী পন্থা হল, যা তাদের জন্য ইতিমধ্যেই ক্রমশ আরও ভালোভাবে কাজ করছিল তাকে জোরদার করার মধ্যে দিয়ে নিরাপত্তার বন্ধনকে আরও গভীর করা। মিনিল্যাটারাল বা স্বল্পসংখ্যক রাষ্ট্রের দ্বারা গঠিত পুঞ্জ ও মাল্টিল্যাটারাল বা বহু সংখ্যক রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত পুঞ্জ – দুই ক্ষেত্রেই এই দুই রাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে স্পষ্টতই বন্ধুত্বপূর্ণ। তার কারণ, তর্কসাপেক্ষে, যে মাল্টিল্যাটারালিজমের প্রতি যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের জাপানের ঝোঁক ছিল তা এই পরিকাঠামোগুলি মেনে চলে এবং কোনও রকম আনুষ্ঠানিক মৈত্রীস্থাপনের উপর ভারতের বিরাগ।

যেমন, ২০১৭ সাল থেকে কোয়াডের – ভারত, জাপান, ইউ.এস এবং অস্ট্রেলিয়ার – যুগ্ম বিবৃতির বিশ্লেষণগুলির উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রত্যক্ষ করা গেছে। চীনের নাম সরাসরি উল্লিখিত না হলেও, ইন্দো-প্যাসিফিকের প্রেক্ষিতে "নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি আনার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা"-র প্রসঙ্গটি যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ। এর পাশাপাশি,– ভারত, জাপান ও ইউ.এস; ভারত জাপান ও অস্ট্রেলিয়া; এবং সাম্প্রতিকতম ভারত, জাপান ও ইতালি – এই ত্রিপাক্ষিক পুঞ্জ বা ট্রাইল্যাটারালগুলিরও অগ্রগতি হয়েছে।

এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, ভারত, জাপান ও ফ্রান্সসহ একটি ত্রিপাক্ষিক পুঞ্জ স্থাপনের কথা, তর্কসাপেক্ষে, ভাবা উচিত। ২০১৮ সালে নিজেদের পররাষ্ট্র নীতিতে ইন্দো-প্যাসিফিক পরিভাষাটিকে একটি ধারণা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি এই অঞ্চলে ফ্রান্সের সামরিকবাহিনীর উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি আছে এবং ভারত ও জাপান – দুই দেশের সঙ্গেই সমুদ্রপথে যোগাযোগ স্থাপনে ফ্রান্স উৎসাহী। এর থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ফ্রান্স ইন্দো-প্যাসিফিকের প্রতিরক্ষার পরিকাঠামোতে মুখ্য অংশীদার এবং অবদানকারী হওয়ার মত অবস্থায় আছে।

দ্বিতীয় পন্থাটি হল, উপকূলরক্ষার ক্ষেত্রে ভারত ও জাপানের পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরও জোরদার করা। জাপানের সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার কারণে তার মেরিটাইম সেলফ-ডিফেন্স ফোর্সের (জেএমএসডিএফ) পক্ষে প্রথাগত নৌবাহিনীর ভূমিকা নেওয়া সম্ভব নয়। তবে, অনেক সময় যে তথ্যটি অবহেলিত হয় তা হল, জাপানের একটি অত্যন্ত দক্ষ উপকূলরক্ষক বাহিনী আছে। ২০০০-এর দশকের শুরুর দিকে এই উপকূল রক্ষাবাহিনীর পরিবর্তনকে "কোল্ড ওয়ারের পরবর্তী সময়ে জাপানের সামরিক বাহিনীর সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সব চেয়ে কম প্রচারিত উন্নয়ন" বলে আখ্যা দেওয়া হয়। তার পর থেকেই চীনের "ধূসর অঞ্চল" সংক্রান্ত কার্যকলাপকে প্রতিহত করতে জেসিজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এবং অন্যান্য অনেক সামরিক তৎপরতা দেখিয়েছে।

২০২১ সালে চীন একটি সমস্যাজনক নতুন উপকূলরক্ষা আইন প্রণয়ন করে। কখন চীনা উপকূলরক্ষকরা বলপ্রয়োগ করতে পারবেন এবং বিতর্কিত অঞ্চলের উপর অধিকারের দাবীকে আরও জোরাল করতে ঠিক কখন বেইজিংকে সামিল করা যাবে তা এই আইনে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। জাপান অবশ্যই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও, উপকূলরক্ষাকেন্দ্রিক সম্পর্ককে আরও জোরালো করা আসলে ঠিক কতটা প্রয়োজন তা এই আইনটি থেকে বোঝা যায়।

যদিও জেসিজি আর ভারতীয় উপকূলরক্ষা বাহিনী যুগ্মভাবে জলদস্যু-বিরোধী এবং সন্ধান-ও-উদ্ধারের কাজ পরিচালনা করে ও ২০০৬ সাল থেকেই সহযোগিতার স্মারকলিপি বা মেমোর‍্যান্ডাম অফ কোঅপারেশান আছে, এই জাতীয় প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কর্মপদ্ধতিকে আরও বিস্তৃত করা খুবই দরকার। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, এলডিপি প্রস্তাব রেখেছে যাতে জাপান এসডিএফ ও উপকূল রক্ষাবাহিনীর ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে এবং এসডিএফ আর ইউ.এসের সামরিক বাহিনীর যুগ্ম কুচকাওয়াজে জেসিজিকে অন্তর্ভুক্ত করতে উৎসাহ দিচ্ছে। ভারত মহাসাগরে চীনা নৌবহরের হঠাৎ হঠাৎ হানা দেওয়া নিয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভারত জেসিজির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করলে উপকৃত হতে পারে। একটি সম্ভাবনা হল, ভারত, জাপান ও ইউ.এসের বার্ষিক মালাবার নৌবহর কুচকাওয়াজে জেসিজিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

তৃতীয় পন্থাটি হল, নিজেদের অবস্থানের পর্যালোচনা করা ও চীনের সঙ্গে অঞ্চল সংক্রান্ত সংবেদনশীল সমস্যার বিষয়ে আরও জোরালো সমর্থন জানান। ২০১৭ সালের আগস্ট মাসের চীন-ভারত ডোকলাম অচলাবস্থার সময় জাপান যেমন তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। এই সময় জাপান দূতাবাস থেকে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে বলা হয়, "বলপ্রয়োগ করে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করার কারো পক্ষেই উচিত নয়"। এই ঘটনা জাপানের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম, কারণ জাপান অন্যান্য দেশের স্থিতাবস্থা নিয়ে রাজনৈতিক মন্তব্য করা থেকে সাধারণত বিরতই থাকে।

তাই হয়ত সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে জাপান ও চীনের মধ্যে যে অঞ্চল সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব আছে সেই বিষয়ে ভারত যদি নিজের অবস্থানকে পুনঃবিবেচনা করে তাহলে ভালো হবে। এখনও পর্যন্ত, নতুন দিল্লি খুব সাবধানে এই দ্বীপপুঞ্জ যাকে জাপান নিজের "ইনহেরেন্ট টেরিটোরি" হিসেবে দেখে সে বিষয়ে কোনও বিবৃতি দেওয়া এড়িয়ে গেছে। যদিও ইউ.এসই একমাত্র দেশ যে এই বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছে, কিন্তু যদি নতুন দিল্লি এই অঞ্চলে আরও বেশি প্রাধান্য পেতে চায় তবে তাকে কোনও এক সময় হয়ত একটি নির্দিষ্ট অবস্থান নিতেই হবে।

**প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম ক্রয়বিক্রয়**

২০১৪ সালে, জাপানের যে যুদ্ধপরবর্তী শান্তিবাদ অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানি ও বিক্রয়ে বাধা দিচ্ছিল তা থেকে বেরিয়ে এসে এই দেশ ১৯৬৭ সালে জারি হওয়া অস্ত্র রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেয়। তারপর থেকে প্রায়ই জাপান ভারতকে অস্ত্র বিক্রি করার আগ্রহ দেখিয়েছে। অনেকবার কাছাকাছি এসেও, ইউএস-2 শিনমায়ওয়া সন্ধান ও উদ্ধারের কাজের জন্য বিশেষ করে নির্মিত বিমানটির বিক্রয়ের বিষয়ে দীর্ঘকালীন আলোচনা স্থগিত রাখা হয়েছে এবং এই মুহূর্তে চুক্তিটিকে আর বিবেচনা করা হচ্ছে না বলেই মনে হচ্ছে। ২০১৭ সালে আরেকটি সুযোগ চলে যায়। এই বছর ভারতের নৌসেনা তার প্রোজেক্ট 75(I) উদ্যোগের জন্য ছয়টি উন্নততম ডুবোজাহাজ বানানর জন্য তথ্যের অনুরোধ বা রিকোয়েস্ট-টু-ইনফর্মেশান (আরটিআই) পাঠায়। কিন্তু, জাপানের মিৎসুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ ও কাওয়াসাকি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ, যাদের অগ্রগণ্য প্রতিযোগী হিসেবে ধরা হয়েছিল, তারা এই আরএফটির উত্তর দেয় নি। একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, দুই দেশের সরকারের মধ্যে এই প্রকল্প বিষয়ক একটি চুক্তিতে টোকিয়োর বেশি উৎসাহ ছিল।

এর পাশাপাশি, এখনও পর্যন্ত যে দুই দেশের মধ্যে একটিও চুক্তি সম্ভব হয় নি তার প্রধান কারণ হিসেবে জাপানের দিক থেকে টেকনোলজি ট্রান্সফার সংবেদনশীলতা এবং ভারতের দিক থেকে মূল্য নিয়ে চিন্তাকে দেখান হচ্ছিল। কিন্তু, সৌদি আরবের পরেই ভারত এই মুহূর্তে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারী হওয়ায়, ভারতের অস্ত্রের বাজার জাপানের জন্য লাভজনক হতে পারে। উদীয়মান শক্তি হিসেবে নতুন দিল্লির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধাস্ত্রের জন্য তার আগ্রহ দ্রুতগতিতে বাড়বে। দুই দেশের মধ্যে এই স্পষ্ট চাহিদা ও সরবরাহের সম্ভাবনার দিকে তাকিয়েই তাদের উচিত নিজেদের যাবতীয় উদ্বেগ ও বাধার সমাধান খুঁজে বের করতে উৎসাহিত হওয়া।

সঙ্গে সঙ্গে, দুই দেশই যদি ভারতের মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগটি নিয়ে আরও চিন্তা করে এবং কি ভাবে তারা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সরঞ্জাম কেনাবেচা এবং/অথবা জাপানের ট্রান্সফার অফ টেকনোলজির সাহায্যে উৎপাদনকে একত্রিত করতে পারে সে বিষয়ে বিবেচনা করে তবে তা থেকে কিছু উপকার হবে। ভারতে যখন বিনিয়োগের সুযোগের নকশা স্পষ্টভাবে আঁকা হয়ে আছে এবং ইউকে, ইউ.এস, ফ্রান্স এবং ইজরায়েল ইতিমধ্যেই বৈদেশিক বিনিয়োগকারী হিসেবে উপস্থিত তখন দুই রাষ্ট্রের জন্যই এই উদ্যোগটি বহুল পরিমাণে সুযোগসুবিধা এনে দেবে। জাপানের সামরিক শিল্প "ভঙ্গুর, কারণ অনেক ব্যবসায়িক সংস্থাই উৎপাদনের ব্যাপারে অনুকূল মনোভাবাপন্ন নয়" এবং সে দেশের এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে যে একটি আপৎকালীন অবস্থা তৈরি হয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যদিও উচ্চমূল্যের জিনিসের আদানপ্রদানই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কিন্তু শুরুর দিকে ছোট জিনিসের রপ্তানিই বেশি কার্যকর হবে। জাপানে তৈরি নজরদারির র‍্যাডার, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি ইত্যাদির আমদানি নিয়ে ভারতের চিন্তা করা উচিত। উপরন্তু, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিপরীতে টোকিয়ো এমন একটি কৌশল নিয়েছে যার ফলে টোকিয়োর অস্ত্রের রপ্তানি বেশি সফল হয়েছে বাণিজ্যিক চুক্তির মাধ্যমে নয়, বরং ওভারসীজ ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিসট্যান্স (অডিএ)-এর সাহায্যে হস্তান্তরের মাধ্যমে। ভারতও এই পন্থা অনুসরণ করতে পারে। চিরকালই উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে জাপানের ওডিএ ব্যবহৃত হত। কিন্তু, ২০১৪ সালে জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অ্যাবে একটি নতুন ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন চার্টার জারি করেন যা ওডিএ-কে একটি বিশেষ "কৌশলগত প্রাধান্য" দেয়। এর ফলে বর্তমানে ওডিএর সাহায্যে যুদ্ধাস্ত্র সংক্রান্ত সরঞ্জামের হস্তান্তরও ঘটছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে যায়, ২০১৪ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ফিলিপাইন্স জাপান থেকে যে ওডিএ পেয়েছে তার ১২.২ শতাংশ যুদ্ধাস্ত্র হস্তান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে – যেমন জেআইসিএর আর্থিক সহায়তায় দশটি চল্লিশ মিটার মাল্টি-রোল রেসপন্স ভেসেল (এমআরআরভি) তৈরি করা। ২০০৩ সালে চীনকে সরিয়ে জাপানের ওভারসীজ ওডিএর বর্তমান সর্বোচ্চ গ্রাহক ভারত এই বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে দেখতে পারে।

কোভিড-19 অতিমারীর কারণে যে জরুরী অবস্থার বাতাবরণ তৈরি হইয়েছে, বিশেষ করে চীনের প্রেক্ষিতে, সেই পটভূমিতে যে মৈত্রী ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কল্পনা অ্যাবে আর মোদী ভাগ করে নিয়েছিলেন এবং গত এক দশক ধরে চালিয়ে নিয়ে গেছিলেন তা আবার শুরু করা উচিত। যদি ভারত-জাপান সহযোগিতার উদ্দেশ্য হয় আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও ইনো-প্যাসিফিকের সমৃদ্ধি বাড়ান তবে এখনই তার উপযুক্ত সময়। অন্যথায়, অদূর ভবিষ্যতে এই সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বকেন্দ্রিক মৈত্রীবন্ধনের অচলাবস্থায় চলে যাওয়ার বা, খুব বেশি হলে তখনও নির্মীয়মান অবস্থাতেই থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

*বিন্দু মাই চোটানি মেইজি বিশ্ববিদ্যালয় ও রিৎসুমেইকান এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অ্যাডজানক্ট লেকচারার। তিনি ২০২২ সালের ফলে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিস্টিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবেন।*